জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-৪

মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত বলতে তিনি ছাড়া তার পরবর্তী সবাইকেই বুঝায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সবাই তাঁর উম্মত। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তারা উম্মতে ইযাবাহ্ এবং যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে বলা হয় উম্মতে দাওয়াহ। সাহাবী, তাবে'ঈন, তাবয়ে তাবেঈন, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, আদীব, গাউস, কুত্ব, আবদাল, আওতাদ, অলী-বুযুর্গ সবাই তাঁর উম্মতের সারিতে অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে কেউ মুহাদ্দিস, কেউ মুফাসসির, কেউ ফক্বীহ, কেউ আদীব, কেউ দার্শনিক।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন বলে উম্মতের মধ্যে তিনি তরজুমানুল কোরআন বলে খেতাব লাভ করেছেন। অন্য সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে উম্মতে মুসলিমা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির বলে মেনে নিয়েছেন। যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফিক্বহের ক্ষেত্রে। তবে সাহাবীদের সকলেই তাফসীর বিশারদ ছিলেন। কেউ কারো থেকে কম নন, একজন থেকে অন্যজন বেশি।

পবিত্র কোরআন যেহেতু কুলহীন মহাসাগরের মত, সে কারণে প্রত্যেক সাহাবীই আপন আপন জায়গায় পবিত্র কোরআনের অগাধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন, যা তাঁরা অর্জন করেছেন সাহেবে কোরআন স্বয়ং রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে। সাহেবে কোরআনের প্রথম ছাত্র সাহাবায়ে কেরাম। কোরআনের তাফসীর পরিপূর্ণভাবে অবগত ছিলেন স্বয়ং রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। বরং তিনি ছিলেন জীবন্ত কোরআন। তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মই ছিল পবিত্র কোরআনের বাস্তব তাফসীর, যা খুব কাছ থেকে অবলোকন করতে পেরেছেন সাহাবায়ে কেরাম। সে কারণে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর পরই নির্ভর করতে হবে সাহাবায়ে কেরামের উপর। বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা পেতে হলে সাহাবীদের উপর নির্ভর করতেই হবে এবং তাঁদের কাছ থেকেই তা গ্রহণ করতে হবে। এভাবে সাহাবীদের থেকে তাবে'ঈ এবং তাঁদের কাছ থেকে তাবয়ে তাবে'ঈগণ এবং তার পরবর্তী প্রত্যেক যুগের আলিমগণ তৎপূর্ববর্তী আলিমদের থেকে তাফসীর গ্রহণ করেছেন। এই কারণেই প্রতিটি তাফসীরেই কোন আয়াতে করীমার তাফসীর করার সময় তার পূর্ববর্তী আলিমদের রেফারেন্স টেনে আনা হয়, যা সাহাবা-এ কেরাম পর্যন্ত প্রলম্বিত; আসলে এটা একটা অপরিহার্য বিষয়। কারণ যদি প্রশ্ন করা হয়, যে কোরআন বুঝার জন্য বা তাফসীর বুঝার জন্য কি প্রয়োজন?

তাহলে সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে বা আমলে না এনে পবিত্র কোরআন বুঝা সম্ভবই নয়। আরো একটু ব্যাপকভাবে বলতে হয়। মনে করুন, অনারবী একজন লোক, সে বাঙ্গালী হোক আর জাপানী হোক, তিনি যদি পবিত্র কোরআন বুঝতে চান, তবে তাকে সর্বপ্রথম আরবী ভাষার চর্চা করতে হবে এবং এ জন্য তাকে আরবী ভাষাবিদদের কাছ থেকে অথবা তাঁদের প্রণীত আরবী অভিধান থেকে আরবীভাষা শিখতে হবে। তার মানে পবিত্র কোরআন বুঝার জন্য সর্বপ্রথম কাজ হল আরবী ভাষাবিদদের দ্বারস্থ হওয়া, তাদের কাছ থেকে শেখা। আর এ জন্য তাঁদের উপর আস্থা রাখতে হবে।

'সফর' আর 'নফর' এর অর্থ ও পার্থক্য কি তা বুঝতে হলে একজন বাঙ্গালীকে 'কামূস' খুলতে হবে, যেতে হবে আল্লামা ফিরোজাবাদীর কাছে। ফিরোজাবাদীদের দ্বারস্থ না হয়ে বা তাঁদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে না করে কোরআনের ঐ দু'শব্দ সফর ও নফরের অর্থ ও পার্থক্য রবী ঠাকুরের সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। 'আকীমুস সালাত'-এর অর্থ বুঝতে হলে 'তাজুল আরূছ' অভিধানের সবক নিতে হবে। আল্লামা জুবায়দীদের কাছে ভাষা না শিখে কোরআন পড়তে গেলে ইকামতে সালাত অর্থ ইকালাতে সালাত বা নামায উৎখাত করা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আসলে এটা শুধু আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই নয়। যেকোন ভিনদেশী ভাষা শেখার প্রথম ধাপ হল ভাষাবিদদের দ্বারস্থ হওয়া ও তাদের

প্রণীত অভিধান পাঠপর্যালোচনা করা। পবিত্র কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, সেহেতু কোরআন শরীফ বুঝার জন্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য আরবী ভাষাবিদদের প্রণীত আরবী অভিধানের সাহায্য নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত পবিত্র কোরআনের মূল তাফসীর বা ব্যাখ্যা হল হাদীস তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী, যা মুহাদ্দিসীনে কেরামের সৌজন্যে প্রাপ্ত। বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সঙ্কলন। নবীযুগের অনেক বছর পরে তাঁর জন্ম হওয়ার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস পাওয়ার জন্য তাঁকে কমপক্ষে তিন জন মুহাদ্দিস বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পেতে হয়েছে। বর্ণিত কোন হাদীস সঠিক বা নির্ভরযোগ্য হতে হলে ঐ তিনজন বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য হওয়া শর্ত। এভাবে পুরো বুখারী শরীফ আমাদের নিকট তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তার হাজার হাজার বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের গ্রহণযোগ্যতা আমাদের কাছে প্রশ্নাতীত হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার মহিমায় তা-ই আছে। বর্ণনাকারী হাজার হাজার মুহাদ্দিস প্রশ্নাতীতভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলেই বুখারী শরীফ সর্বজন গৃহীত। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে বুখারী শরীফের বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য নয়, তা হলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বুখারী শরীফ তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সহজ ভাষায় এভাবে বলতে হবে, যে হাদীসের বর্ণনাকারী যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে নির্ভরযোগ্য তবে ঐ হাদীসও গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর কোন অংশে বা পুরোপরি ত্রুটিমুক্ত নয়, তবে সে হাদীসের মানও সে আলোকেই নিরূপিত হবে। এবার আমরা এভাবে বলতে পারি, হাদীসের মাধ্যমে কোরআনের তাফসীর করতে গেলে মুহাদ্দিসগণের নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি আগে দিতে হবে। তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করলে যেহেতু হাদীসই নির্ভরযোগ্য থাকে না; সুতরাং সে হাদীস দিয়ে পবিত্র কোরআনের তাফসীর করা যাবে না।

তৃতীয়ত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগেই পবিত্র কোরআনের তাফসীরগ্রন্থ লিখা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবনের জন্য সময়কে আলোকিত করা সে সকল তাফসীর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে রূহুল বয়ান, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, তাফসীরে কুরতুবী'র মত নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ আমলে না এনে কেউ তাফসীরে হাত দেয়া মানে হবে, অদ্ভুত! উটের পিঠে চড়ে মৃত্যুপুরীর অজানা গন্তব্যে চলা।

পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝার জন্য আরো অনেক মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার যা এখানে বলা প্রাসঙ্গিক নয়। সঙ্গত কারণে আমি শুধু অভিধানবেত্তা, মুহাদ্দিস ও তাফসীর বিশারদদের প্রসঙ্গ আলোচনায় আনলাম এবং বক্তব্যের মূল সারাংশ এই যে, পবিত্র কোরআন বুঝার জন্য আরবী অভিধান পড়তে হবে, যার জন্য অভিধানবেত্তাদের উপর নির্ভর করতে হবে; হাদীসের বিশাল সম্ভার জানা থাকতে হবে এবং এ জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরামদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে এবং নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থগুলোর উপর গভীর দৃষ্টি রাখার জন্য তাফসীর বিশারদদের গ্রহণ করতে হবে।

এবার জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদূদীর ধারালো এবং ঝাঁঝালো একটা বক্তব্য লক্ষ করুন:

"উম্মতকে তামাম ফুক্বাহা, মুহাদ্দিসীন, মুফাস্সিরীন আওর আইম্মায়ে লুগাত কো সা-কিতুল ই'তেবার ক্বরার দে-না তা কেহ্ মুসলমান কোরআনে মাজীদ কো সমঝনে কেলিয়ে উন্ কি তরফ রুজূ- না করে-।"

অর্থাৎ: "উম্মতের সকল ফক্বীহ্, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও (আরবী) ভাষাবিদদের বিবেচ্যহীন মনে করতে হবে, যাতে মুসলমান পবিত্র কোরআন বুঝতে গিয়ে তাদের প্রতি মনোনিবেশ না করে।" তরজুমানুল কোরআন মনসবে রেসালাত: ১৫পৃষ্ঠা

প্রিয় পাঠক মি.মওদূদীর উপরের বক্তব্যটি আরো একবার পড়ুন। উম্মত বলতে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকেই সাধারণত বুঝানো হয়ে থাকে, যা আমরা আগেই বলেছি। উম্মতের ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাস'ঊদ, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আয়েশা, হযরত মুযাহিদ, হযরত ইমাম আবূ হানিফা, হযরত ইমাম শাফে'ঈ, হযরত ইমাম মালেক, হযরত ইমাম আহমদ, হযরত ইমাম বুখারী, হযরত ইমাম মুসলিম, হযরত ইমাম তিরমিযী, হযরত ইমাম নাসাঈ,

হযরত ইমাম আবূ দাঊদ, হযরত ইমাম ইবনে মাযাহ, হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, হযরত মুজাদ্দেদী আলফেসানী, হযরত ইমাম তাবারী, হযরত ইমাম ইবনে কাসীর, হযরত ইমাম কুরতবী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এক কথায় সবাই উম্মতের মধ্যে শামিল। তাঁরা সবাই পবিত্র কোরআন নিয়ে কম বেশি কাজ করেছেন। তবে এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা এমনকি অপরাধ করলেন যার কারণে কোন মুসলমান কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার পরামর্শ দিলেন মি.মওদূদী!

'সাকেতুল ইতেবার' শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এই শব্দটি ব্যবহার হলে এই অর্থ দাঁড়ায় যে, তার কথার কোন মূল্যই নেই বা তিনি কোন কথা বললে তা গ্রহণ করা যাবে না। আর ঠিক এই শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে উম্মতের সকল ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের ব্যাপারে। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পবিত্র কোরআনের অর্থ বা তাফসীর বা অন্য কোন বিষয়ে হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কথার কোনও মূল্য নেই, হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কথার কোনও দাম নেই, হযরত ওসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কথার কোন মূল্য দেয়া যাবে না, হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না। হযরত ইমাম আবূ হানিফা, হযরত ইমাম শাফে'ঈ, হযরত ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এদের কোন দাম নেই। কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহদের কথার কোনও মূল্য নেই। তাঁরা সবাই 'সাকেতুল ইতেবার'।

সাহাবা-এ কেরামসহ তাবৎ পৃথিবীর ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও তাফসীর বিশারদদের প্রসঙ্গে এমন অপবিত্র কথা আলোচনা করার রুচিবোধ আমার নেই। কিন্তু তারপরও বাধ্য হয়ে এ কথাগুলো লিখতে হচ্ছে এ কারণে যে, একটি ইসলামী দলের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম করতে চান তার মুখের অপবিত্র বক্তব্য এটা! দেখুন, মওদূদী সাহেবের সাথে জমি-জমা বা টাকা-পয়সা নিয়ে আপনাদের মত আমারও কোন বিরোধ নেই। তবে কেন তার সাথে আমার বিরোধ? কত মায়ের সন্তান আজ মওদূদীর নাম শুনলে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানায়, কত শিক্ষিতজনেরা মওদূদীর আদর্শকেই ইসলাম বলে বিশ্বাস করে, স্কুল কলেজের কত ছাত্র আজ মওদূদীর মিছিলের সক্রিয় সদস্য। তাদের প্রতি আমার আক্রোশ নেই, অনুকম্পা রয়েছে।

একবার ভাবুন তো, সিদ্দীক্ব-এ আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মূল্যহীন ঘোষণা করে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্লোগান বাতাসে ভাসছে, সে ইসলামের বাড়ি কোথায়? ফারূক্ব-এ আ'যম হযরত ওমর, হযরত ওসমান যুন্নুরাঈন, আসাদুল্লাহিল গালিব হযরত মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে 'সাকেতুল ইতেবার' মনে করে আমাদেরকে কোন পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? বুখারী-মুসলিম -তিরমিযী-আবূ দাঊদ-নাসাঈ-ইবনে মাজাহদের অবমূল্যায়ন করে সাকেতুল ইতেবার মনে করে মওদূদীর অপবিত্র কলম কাকে মূল্যায়ন করতে শিখেছে?

আমি জামায়াতের আদর্শে বিশ্বাসী ভাইদের নিরপেক্ষভাবে মওদূদী সাহেবের উক্ত বক্তব্যটি লক্ষ করার অনুরোধ জানাই। পবিত্র কোরআন বুঝার জন্য মি.মওদূদী চার শ্রেণীর লোককে সাকেতুল ইতেবার মনে করা জরুরি বলে বিশ্বাস করতেন এবং মানুষদেরকেও তার সবক প্রদান করেছেন: ১. উম্মতের সকল মুহাদ্দিস, ২. উম্মতের সকল ফক্বীহ, ৩. উম্মতের সকল মুফাস্‌সির এবং ৪. উম্মতের সকল (আরবী) ভাষাবিদ।

জামায়াতের সকল সদস্যের কাছে আমার প্রশ্ন উপরিউক্ত চার শ্রেণীভুক্ত লোকদের বাদ দিয়ে এমন কোন আলাদীনের চেরাগ আছে, যার দ্বারা কোরআনে কারীম বুঝা সম্ভব?

সাহাবীদের মধ্যে অসংখ্য ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির সাহাবী ছিলেন। তামাম ফক্বীহ্, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির বলতে যেহেতু তাঁদেরকেও বুঝায়, সেহেতু খুব আগ্রহ নিয়েই জামায়াত সদস্যদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন করতে মনে চায়, জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা মওদূদী সাহেবের এই বক্তব্যের সাথে একমত কি-না। যদি না হন তবে এ রকম অপবিত্র বক্তব্য দেওয়ার কারণে মি.মওদূদী সাহেবের ব্যাপারে তাদের অবস্থান কি তা জাতির সামনে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা দরকার বলে আমি মনে করি, যা বিগত পাঁচ যুগেও আমরা পাইনি। বরং জামায়াতের সাহিত্যে মওদূদীকে ১৪০০ বছরের ইতিহাসে একমাত্র সফল মুজাদ্দিদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার অর্থ জামায়াতে ইসলামী মওদূদীর বক্তব্যের সাথে একমত। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে খাঁটি মুসলমানদের আজ এ

কথা বলার সময় এসেছে, যেই দলে সিদ্দীক্ব-এ আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কোন মূল্য নেই, ফারূক্ব-এ আ'যম হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কোন মূল্য নেই, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র দাম নেই, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফক্বীহদের কোন মূল্য নেই, সেটা কোন মুসলমানদের দল হতে পারে না। আজ থেকে আট-নয় বছর আগে সেক্যুলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী এক লোককে বলতে শুনেছি, 'জামায়াতে ইসলামী'তে সবই আছে, তবে ইসলাম নেই। মি.মওদূদীর উপরিউক্ত বক্তব্য পড়ে আমার কাছে ওই ব্যক্তির কথাটি সঠিকই মনে হচ্ছে।

এক্ষণে মি.মওদূদী সাহেবকে একটি প্রশ্ন করা খুবই সমীচীন মনে করি। উম্মতের এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি একাধারে মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্ ও মুফাসসির। তাঁর নাম হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তাঁকেও মওদূদী সাহেব নিশ্চয়ই 'সাকেতুল ইতেবার' তথা অগ্রহণযোগ্য বা অবিবেচ্য মনে করেন। তাঁকে যদি সাকেতুল ইতেবার মনে করা হয়, তবে পবিত্র কোরআনও সাকেতুল ইতেবার তথা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। কারণ হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাতেই পবিত্র কোরআন মাজীদ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়েছে। মওদূদী সাহেবের কাছে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাকেতুল ইতেবার হওয়ার কারণে তাঁরই হাতে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত কোরআন যেহেতু অনিবার্যভাবেই 'সাকেতুল ইতেবার' হয়ে যায়; আর সাকেতুল ই'তিবার কোন কিতাব কোন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হতে পারে না।

সেহেতু প্রশ্ন হল, মওদূদী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলাম'র ধর্মগ্রন্থের নাম কি!!! আসলে মওদূদীর বক্তব্যে এই যুগের সালমান রুশদী ও তাসলীমা নাসরিনদের প্রতিচ্ছায়াই দেখা যায়!

এ ছাড়া সকল মুহাদ্দিস 'সাকেতুল ইতেবার' হলে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ হাদীস শরীফের সকল কিতাবই তো 'সাকেতুল ইতেবার' হয়ে যায়। হায়! আফসোস!! বদ নসীব!!! জামায়াতের ভাগ্যে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ সিহাহ্ সিত্তাহর কোন কিতাবই নেই। সা'ঈদীর মাহফিলে এই কারণেই হয়তো কোন তাফসীর বা হাদীসের কিতাবের রেফারেন্স থাকে না। আর যেই দলে তামাম মুহাদ্দিস, ফক্বীহ ও মুফাসসির 'সাকেতুল ইতেবার' সেই দলে সাঈদীর মত লোকেরা মুফাসসির হতেই পারে! এবং এই একই কারণে জামায়াতের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মত কিছু চাটুকার এবং কামাল জাফরীর মত কিছু দালাল ব্যতীত কোন হক্কানী আলিমের সমর্থন জামায়াতের ভাগ্যে জোটেনি।

কারণ, জামায়াতের ঘরে সাহাবী থেকে শুরু কোন অলি-গাউস-কুত্ব, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরই জায়গা পায় নি। তাদের হলুদ চশমায় মি.মওদূদী ছাড়া পরিপূর্ণ ঈমানদারই বা কোথায়? ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারত থেকে প্রকাশিত জামায়াতের মাসিক পত্রিকা 'জিন্দেগী'তে জামায়াতের এক সদস্য লিখেছেন, "জামায়াতের সাহিত্য পড়ে আমার মধ্যে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তাতে এখন আমি সাহাবাদের পরে আজ পর্যন্ত মওদূদী সাহেব ব্যতীত অন্য কাউকেই পরিপূর্ণ ঈমানদার মনে করি না।" আস্তাগফিরুল্লাহ্! ঐ একই পত্রিকায় একই ব্যক্তি আরো লিখেছেন, "আমি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর মতাদর্শকে ভুল মনে করি। উম্মতের বড় বড় প্রসিদ্ধ মনীষীরা পরিপূর্ণ ঈমানদার কি-না তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

পাঠক, এই হল জামায়াতের আসলরূপ!